PEARL COACHING CENTER : 9076664708
NSOU | UG,BDP,PG | ALL SUBJECT | ASSIGNMENT | NOTES

PGBG- 2

প্রশ্ন : **ভাষা পরিকল্পনা কাকে বলে? ভাষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।**

অথবা

ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা লেখো।

উঃ ভাষা পরিকল্পনাঃ ভাষাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার, যথার্থভাবে উপস্থাপন ও তার মান উন্নয়নে ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে প্রথম ভাষা সংস্কারের কাজ করেছেন পাণনি। তাঁর ভাষাকে উদর, মুক্ত, দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরতে চাইছে। যে ভাষা, জাতীয় ভাষায় উন্নীত হওয়ার কার্যকলাপ করে চলেছে। সেই ধারাবাহিক সচেতন প্রয়াস হল ভাষা পরিকল্পনা।

উদ্দেশ্য : ভাষা পরিকল্পনার প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য –(১) অবস্থান পরিকল্পনা ও (২) গঠনগত পরিকল্পনা এই দুই উদ্দেশ্য ছাড়াও আরো কতগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেগুলি হল—

১) ভাষা পরিকল্পনার সাহায্যে ভাষাকে সামাজিক অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে রূপান্তর করা।

২) ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বা প্রদেশ বিভাজন ও ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত।

৩) ভাষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কোনো ভাষার বানান উচ্চারন ও অর্থগত সমস্যার সমাধান করা।

৪) ভাষা ব্যবহারের অনুপাত অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা নির্ধারণ করাও এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কাজ।

৫) ভাষা পরিকল্পনার সঙ্গে ভাষার নীতিকে যুক্ত করা হয়।

৬) ভাষা পরিকল্পকদের কাজ হল বিভিন্ন তত্ত্ব বা সূত্র প্রতিষ্ঠা।

৭) মৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করা ও ভাষা পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে।

গ্রাম সাধারণ মানুষেরা বাড়িতে থাকলে একরকম কথা বলে আবার ও গ্রামেরই ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায় তখন মোটামুটি ভদ্র বাংলাই বলে। স্থান অনুযায়ী বক্তার এই যে ভাষার পরিবর্তন একে 'Code-switching' বলে।

ধর্ম অনুযায়ী ভাষা : শ্রেণি উপভাষায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মগত ভিন্নতার কারণে ভাষা ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন

হিন্দু	মুসলমান
জল	পানি
বই	কিতাব
প্রতিদিন	হররোজ
মা কালির দিব্যি	আল্লার কসম
খাঁটি কথা	হক কথা

High Quality Notes | Cash On Delivery | Low Price
Free Home Delivery

হরি দিন তো গেল আল্লা দিন তো গেল

সন্ধ্যা হল পার কর আমারে সন্ধ্যা হল দুনিয়ার মালিক পার কর আমারে (মুসলিম অন্ধ ভিখিরি)

মুসলিমদের কথার মধ্যে হিন্দি, উর্দু শব্দের ব্যবস্থা দেখা যায় সেই কারণে খাঁটি বাংলা বলা হিন্দুদের সঙ্গে তফাত হয়।

পেশা অনুযায়ী ভাষা : সামাজিক অবস্থা এবং জীবিকা অনুযায়ী কথা বলবার ধরণ বদলে যায়। যেমন-

অফিস কর্মী – বস যা স্ট্রিক্ট, আজই ফালইটা রেডি করে দিতে হবে।

মজুর— কর্তার কড়া নজর, দু দন্ড যে বিড়ি টানব সে ফুরসত নেই।

ছাত্র— আজR.M., R.P.S তারপর Pb র ক্লাস, কাটার কোনো চান্স নেই।

জীবিকার দ্বারা দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

যেমন-

সব্জী বিক্রেতা – যাঃ শালা বউনি বেলাটায় মাটি।

গ্যারেজ কর্মী— সকালবেলায় পাংচার হয়ে গেল।

২) কোডায়ন: কোডায়ন বলতে শব্দায়ন ও ব্যাকরনায়ন। কোডায়ন কোনো একজনের কাজ হতে পারে। যে কমবেশি লেখালেখি তে প্রয়োগ করে। অনেক সময় খ্রিষ্টান মিশনারি কখনো বিদেশি লোকেরা কোডায়নের ব্যবহার করে। সে ভাষা যে এমন কোনো কারণ নেই। কোডায়নের প্রথম পদক্ষেপ হল লিপায়ন অর্থাৎ বর্তমান কোনো লিপির ভিত্তিত কোনো লিপিমালা প্রস্তুত করা।

যেমন– Srabo তাঁর নিজের ভাষা ফ্যারাওয়েজ-এর জন্য লাতিন বর্ণমালার সাহায্য নিয়েছিলেন। কোডায়নের মূল কথা হল শুদ্ধ ব্যাকরনের নিময় বেছে নিয়ে এক ধরনের লিপি নির্বাচন এবং অভিধান প্রণনয়।

৩) প্রয়োগ: যে সমস্ত ভাষার রূপের নির্বাচন ও কোডায়ন হয়েছে। লেখক প্রতিষ্ঠান, সরকার তা যখন স্বীকার করেন এবং তা প্রচার করেন, সেই সমস্ত কার্যকলাপকে প্রয়োগ বলা হয়। সমস্ত বই, সংবাদপত্র এবং পাঠ্য পুস্তক সেই ভাষায় লেখা হবে। এছাড়া বেতার দূরদর্শনেও সেই ভাষা চালু হবে। এই ভাষা নিয়ে আইন কানুনও তৈরি হবে।

৪) প্রসারণ : আধুনিক জগতে সব ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। প্রয়োগেরই বিস্তৃত রূপ হচ্ছে প্রসারণ। উচ্চ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দরকার নতুন নতুন শব্দের সম্ভার সেই সকল শব্দ নিয়ে যখন ভাষাকে সমৃদ্ধ করা হবে। তখনই ভাষার ফাংসান (functio) প্রসারিত হবে।

ভাষা, বিভাষা ও নিভাষার রূপ নিয়ে যেমন নতুন হচ্ছে তেমনি কোডায়ন ও বোধায়নের মাধ্যমে ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটাচ্ছে, সব মিলিয়ে এই যে ভাষা পরিচর্যা, তাই হল ভাষা পরিচর্যা, তাই হল ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্র।

জাতীয় ঐক্য ও রাজ্যের যোগাযোগে কোন ভাষা ব্যবহার হবে এ নিয়েও সমস্যা দেখা যায়।

এই ভাষা পরিকল্পনায় নির্বাচন কৌশলের প্রয়োজন রয়েছে। যার দ্বারা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজীকে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ও হিন্দিকে ব্যবহার করা হবে। স্বাধীনতার পর ভারতে ১৯৬৫ সালে ইংরেজির জায়গায় হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হয়েছিল। তবে অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করা হয়নি। একথা মনে রাখতে হবে অঙ্গ পরিচালনার ক্ষেত্রে তুচ্ছ চর্চা না হয় দাঁড়ায়।

2) অবয়ব পুরিকল্পনা (Corpus Planing) :

একটি সমাজ ভাষাকে সমাজ কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে অবয়ব পরিকল্পনা বলে। এই পরিকল্পনায় কয়েকটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যথা-

ভাষার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলে।

অলিখিত ভাষার লিপি প্রণয়ন।

অভিধান রচনা।

উপভাষার বিশ্লেষণ এবং উপভাষার ভূগোল/মানচিত্র রচনায় প্রয়াসী হওয়া।

ভাষার আধুনিকীকরণ ঘটানো।

হাউগেন ভাষা পরিকল্পনার চারটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন –(১) নির্বাচন (২) কোডায়ন (৩) প্রয়োগ

(৪) প্রসারণ। আবার, ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে যেনুর্ড দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) ভাষা নির্ধারন ও (২) ভাষা উন্নয়ন।

সব মিলিয়ে ভাষা পরিকল্পনায় ভাষাকে Classic মর্যাদা দানের চেষ্টা যে করা হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্নঃ বাক্য কাকে বলে? বাক্যের গঠনগত ও রূপগত শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করো।

উঃ বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"কোনওভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক হইতে যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য (Sentence) বলা হয়।" একালের পাশ্চাত্যের কথাবিজ্ঞানী Bloomfield এর মতে—'ভাষার যেই অবয়ব বা অংশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং অন্য কোনো বৃহত্তর অবয়ব বা অঙ্গের অংশ হবে না, তাই হল বাক্য। এই দুটি মতকে সমর্থন করে সহজভাবে বলা যায়, বাক্য হল ভাষা প্রবাহের বৃহত্তম একক (Unit)।

শ্রেণিভেদ : গঠনবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বাংলা বাক্যকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১) অসমবায়ী।

২) সমবায়ী।

৩) যৌগিক।

৪) সমন্বয়ী।

অধ্যাপক Bloomfield রূপগত শ্রেণিবিভাগ বাক্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। বাংলা বাক্যে একটি বাক্য একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে বা প্রকাশের চেষ্টা করে। স্বভাবতই একটি বাক্যে একাধিক শব্দের সমাবেশ ঘটে।

মনের ভাবপ্রকাশের উপযোগীতা বিচারে বাক্যকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাকে অবলম্বন করে কিছু বলা হয় তা উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তা বিধেয়। বাক্যের এই গঠনগত শ্রেণিবিন্যাসটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাকে মেনে করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্বলিত বাক্যকে রূপগত বিচারে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

১) সরল বাক্য (Simple Sentence)

২) মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence)

৩) যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence)

সরল বাক্য : একটিমাত্র উদ্দেশ্য, একটিমাত্র বিধেয় এবং একটিমাত্র সমাপিকাক্রিয়া থাকলে তা সরলবাক্য হয়।

দৃষ্টান্তঃ সে বাড়ি যাবে

উদ্দেশ্য বিধেয়

তবে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুার মনে করেন যে সরল বাক্যে একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকলেও একটি বিধেয় ও একটি বিধেয়ের মূল সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। তেমনি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটিমাত্র হলেই তা সরলবাকা হয়।

দৃষ্টান্ত : আমি স্নান করে ভাত খেয়ে, কলেজ করে, বাড়ি এসে, খেলতে যাব।

জটিল বাক্য : একটি উদ্দেশ্য, একটি বিধেয় থাকার পরও তার সঙ্গে অন্য কোন গৌণ খন্ডবাক্য যুক্ত হলে মিশ্রবাক্য হয়।

অর্থাৎ একটি প্রধান উপবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান উপবাক্য নিয়ে মিশ্র বা জটিল বাক্য গঠিত হয়।

দৃষ্টান্ত : যদি তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করো, তবে পাশ করবে।

যোগিক বাক্য : যে বাক্যে একাধিক সরল বা মিশ্র বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্য দ্বারা যুক্ত হয়, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। অর্থাৎ একের বেশি প্রধান উপবাক্য সংযোগে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। দৃষ্টান্তঃ "তুমি যাবে এবং আমাকে ডাকবে/ সে বা তুমি কাজটা করবে। (ও,আর,এবং) সংযোজক বিয়োজক (বা, কিংবা অথবা)

প্রশ্নঃ কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যারা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা রস বলে তারা উপসহার করেছেন'—উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর 'রসধ্বনি কাব্যের আত্মা'—মন্তব্যটির সত্যতা বিচার কর। (রসবাদ)

উঃ 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যারা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা রস বলে তারা উপসংহার করেছেন'—এই মন্তব্যে আপাততবাবে একটি বিরোধ বর্তমান মনে হলেও, ধ্বনি ও রসের স্পর্শকটি অনুধাবন করতে পারলে সেই বিরোধের অবসান ঘটে। আমরা সকলেই জানি যে, প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের মধ্যে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তই ছিলেন ধ্বনিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের প্রবক্তা। কাব্যজগতের ধ্বনি সম্পর্কিত ভাবনা আনন্দবর্ধনের পূর্বেও ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম সেই ভাবনার সুবিন্যস্তরূপ লিখিতভাবে আমাদেরী হাতে তুলে দেয়।

'ধ্বনি' বলতে আনন্দবর্ধন কী বুঝেছিলেন সংক্ষেপে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কাব্যের আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে আনন্দবর্ধন উপলব্ধী করেন যে, অলংকার-রীতি-বাচ্য-এর কোনোটির মধ্যেই প্রকৃত কাব্য নেই। শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতিই হচ্ছে বিষয়াত্তরের ব্যঞ্জনা করা। রমনীদেহের লাব্য যেমন তা অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্যকিছু, তেমনই শ্রেষ্ঠ কবিদের বাণীতে এমন কিছু থাকে যা বাচার্থকে ছাড়িয়ে ওঠে। এই অতিরিক্ত কিছুর পরিভাষিক নাম হল 'ধ্বনি'। যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যাঞ্জিতত অর্থকে প্রকাশ করে তাকেই 'ধ্বনি' বলা যেতে পারে। যিনি সার্থক কবি, তিনি অতিক্রম ধ্বনির ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেন।

এই ধ্বনি আবার অনেকুলি শ্রেণি ভাষা আছে যেমন—বস্তুধ্বনি অলংকারধ্বনি, ভাবধ্বনি ও রসধ্বনি, যেখানে বাচার্থ মনোহারি হয়ে ওঠে তাকে বস্তুধ্বনি বলে। অলংকার যেখানে অপ্রধান ও গৌণ হয়ে ভিন্ন অলংকারের ব্যাঞ্জনা আনে, সেখানে অলংকারধ্বনি হয়। আর

ভাবধ্বনিতে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি নয়। শ্রেষ্ঠ ধ্বনি হল-রসধ্বনি। অভিনবগুপ্ত যখন শ্রেষ্ঠ ধ্বনি বিচারে রসধ্বনির কথা বলে, তখন রস ও ধ্বনিকে একসঙ্গে রেখে বিচার করতে চান। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক যে আছে তা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রেষ্ঠ ধ্বনি থাকে কাব্যের মধ্যে, কিন্তু তাকে আবিষ্কার করে পাঠক। সুতরাং পাঠকের সক্রিয় সহযোগীতা ছাড়া ধ্বনি স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গায়কের গান কখনো একাকী সার্থক হয় না শ্রোতায় সক্রিয় উপস্তিত। কাব্যের মধ্যেও যে বিভাব-অনুভাবাদি থাকে তা এক বিষয় এর সঙ্গে লৌকিক জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কাব্যের মধ্যে প্রকৃত ধ্বনি নেই, তা কখনই স্বহৃদয় সংবাদীকে রসের আস্বাদ দান করতে পারে না। রসধ্বনিতে প্রাচের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অঙ্গী রূপে সেই রসই ধ্বনিত হয়। রসই বস্তুত আত্মা। বস্তুধ্বনী ও অলংকারধ্বনী শেষ পর্যন্ত রসেই পর্যবসিত হয়।

আসলে ধ্বনি থাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে কিন্তু স্বচ্ছন্দপাঠক সেই কাব্য পাঠ করে রসের আস্বাদ লাভ করে। অর্থাৎ আরম্ভে যা ধ্বনি, তাই পাঠকের অন্তরে গিয়ে যখন আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে, খন তা হয়ে যায় রস। আরম্ভে ধ্বনি ও উপসংহারে রসের মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্য নেই। কাব্যের মধ্যে ধ্বনি আত্মা রূপে বিরাজ করলেও পাঠকের মানে সেই রসই আত্মা হয়ে যায়। আসলে যথার্থ নির্দিষ্ট করে বললে, বলা উচিত 'রসধ্বনি'ই কাব্যের আত্মা তাই শুরুতে যারা 'ধ্বনি' কাব্যে আত্মা বলেছেন এবং 'রস' কাব্যের আত্মা বলে উপসংসার করেছেন—তাঁদের 'ভাবনা যথার্থ।

আঠারো শতকে রচিত বাংলা ব্যাকরণের এ দুটি নজির ছাড়া বাংলা ব্যাকরণের আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ রচনায় একটি ছোটখাট স্রোত লক্ষ করা যায়। এ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলো প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারার গ্রন্থগুলো বিদেশিদের দ্বারা ইংরেজি ভাষায় রচিত। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া। (১৭৬১-১৮৩৪), হটন, ইয়েটস ও ওয়েঙ্গার এই ধারার ব্যাকরণবিদদের অন্যতম।

দ্বিতীয় ধারার রচয়িতারা ছিলেন প্রধানত বাঙালি এবং তাঁদের রচনার ভাষা ছিল বাংলা। এ ধারার ব্যাকরণের পাঠক ছিল দেশীয় পাঠশালা ও ইংরেজি স্কুলগুসমূহের শিক্ষার্থীরা। প্রায় সবক্ষেত্রে এরকম ব্যাকরণের লেখক ছিলেন টোল বা চতুষ্পাঠীর সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতবর্গ। ফলে তাঁরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে বিচার করে এক ধরনের উপদেশমূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহন রায় এই দুই ধারার ব্যাকরণ রচয়েতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি বিদেশি বা টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মতো বাংলা-সংস্কৃতের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে রচিত হয় উইলিয়ম কেরির বাংলা ব্যাকরণ A Grammar of the Bengali Language। হ্যালহেডের ব্যাকরণের অনুকরণে কেরির গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। তবে হ্যালহেড তাঁর গ্রন্থে বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ বা পার্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্র গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেননি। তবে কেরি তাঁর রচনায় ওই সব বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

হেলিবেরির তৎকালীন ইস্ট-ইন্ডিয়া কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক জি.সি হটন (Graves Chamney Haughton: ১৭৮৮-১৮৪৯) লন্ডন থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন Rudiments of Bengali Grammar । হেলিবেরি কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য হটন এটি রচনা করেছিলেন।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রেভারেন্ড ডব্লিউ ইয়েটস (Rev. W Yates: ১৭৯২-১৮৪৫)। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম Introduction to the Bengali Language (১৮৪৭)। ইয়েটসের ব্যাকরণ দুটি খণ্ডে রচিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে বাংলা ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে বাঙালি কবিদের কবিতা ও সমসাময়িক সাহিত্যের অংশবিশেষ। ইয়েটস তাঁর ব্যাকরণের বিষয় বিন্যস্তকরণে প্রায় পুরোপুরি কেরীর ব্যাকরণের ওপর নির্ভর করেছেন। তবে বাংলা ভাষার শুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কেরীর চেয়ে অধিক সতর্কতা ও রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রেভারেন্ড জে কীথ (Rev. J Keith) রচিত A Grammar of the Bengalee Language গ্রন্থে ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাকরণ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়গুলো প্রশ্নোত্তর আকারে সন্নিবেশিত